মহান মে দিবস এবং বাংলাদেশে গার্মেন্ট শ্রমিকের আন্দোলন

অভিনু কিবরিয়া ইসলাম

‘কমরেড শ্রমিকেরা! মে দিবস আসছে, যে দিবসে সকল দেশের শ্রমিকেরা তাদের শ্রেণি-সচেতন জীবনের জাগরণকে, মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর সকল নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংহতিকে, কোটি কোটি মেহনতি মানুষকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অপমান থেকে মুক্ত করার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামকে উদযাপন করে। এই মহান সংগ্রামে দুইটি দুনিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়; একটি হলো পুঁজির দুনিয়া এবং অপরটি শ্রমের দুনিয়া, একটি শোষণ ও দাসত্বের দুনিয়া এবং অপরটি ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার দুনিয়া।...একপক্ষে আছে মুষ্টিমেয় ধনী রক্তখেকোর দল। তারা সব কলকারখানা, যন্ত্রপাতি দখল করে রেখেছে, আর লক্ষ লক্ষ একর জমি ও টাকার পাহাড়কে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। তারা সরকার ও সেনাবাহিনীকে নিজেদের চাকর ও সম্পত্তির বিশ্বস্ত পাহারাদারে পরিণত করেছে।...অপরপক্ষে আছে কোটি কোটি উত্তরাধিকার বঞ্চিতদের দল। তারা ধনীদের হয়ে কাজ করার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়। তাদের শ্রমে তারা সকল সম্পদ তৈরি করে; অথচ তাদের সারাটা জীবন একটুখানি খাবারের জন্য সংগ্রাম করতে হয়, পিঠভাঙা মেহনতে তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তিকে নিঃশেষিত করতে হয় এবং গ্রামের জীর্ণ কুটিরে অথবা শহরের অন্ধকার কুঠুরিতে উপবাসে থাকতে হয়।’[১]

১৯০৪ সালের মে দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত একটি লিফলেটের খসড়ায় কমরেড লেনিন উপরোক্ত কথাগুলো লিখেছিলেন। শত বছরের বেশি সময় পরেও সেই কথাগুলোর তাৎপর্য ফুরিয়ে যায়নি। বরং এই পুঁজিবাদ নানা রকম মুখোশে আমাদের সামনে এসে হাজির হলেও শোষণ-বৈষম্য-নিপীড়নের মাত্রা তো কমেইনি, বরং আনুপাতিক হারে বেড়ে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে মে দিবসের গুরুত্ব ফুরায়নি, বরং বহুলাংশে বেড়েছে। মে দিবস উদযাপনে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে থামাতে না পেরে শাসকশ্রেণি মে দিবসকে অনুষ্ঠানসর্বস্ব করে তোলার চেষ্টা করছে। শোষক লুটেরা পুঁজিপতিরাও এদিন মেকি শ্রেণি-সম্প্রীতির স্লোগান তুলে মে দিবসের রক্তাক্ত ইতিহাস ও শোষণের ধারাবাহিকতাকে আড়াল করতে চায়। রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের দেশে মে দিবস পালিত হয়; রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বাণী দেন; মালিকদের তরফ থেকেও কর্মসূচি পালিত হয়, আর এই ডামাডোলে শ্রমিকের ন্যায্য দাবিগুলো ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হলেও হারিয়ে যেতে থাকে।

১৮৮৬ সালের শিকাগোর হে শহরে মে মাসে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটে গুলি চালিয়ে হত্যা এবং পরবর্তীকালে শ্রমিক নেতাদের ফাঁসিতে ঝোলানোর ইতিহাস আমরা জানি। শিকাগোর সেই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। পুঁজিবাদের নির্মম শোষণ এবং তার অর্থনৈতিক কাঠামোর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে চক্রাকারে ফিরে ফিরে আসা অর্থনৈতিক মন্দার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সে সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংগঠিত প্রতিবাদ করছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলো তখন সত্যি সত্যি ‘কমিউনিজমের ভূত’ দেখছিল। মার্ক্স সে সময়ই শ্রমিকদের এই সংগঠিত শক্তিকে নতুন সমাজ গড়ার মূল শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি পুঁজিবাদী মজুরি ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতাকে অর্থশাস্ত্রীয় ও দর্শনগত দিক থেকে উন্মোচিত করেছেন, শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে ন্যায়ভিত্তিক ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বাস্তবে মূর্ত করে তোলার রসদ জুগিয়েছেন। শ্রেণিচেতনার হাতিয়ারে সুসজ্জিত শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ঐক্যের মাধ্যমে ‘আত্মাহীন সমাজ’ ও ‘হৃদয়হীন দুনিয়া’র বাস্তবতাকে বদলে ফেলার সংগ্রামকে প্রাণ দিয়েছেন। মার্ক্সের সৃষ্ট সেই ঢেউ লেগেছিল পাশ্চাত্যের শ্রমিক শ্রেণির গায়ে। মার্ক্সের মৃত্যুর তিন বছর পর শিকাগোর হে মার্কেটের ঘটনাটি ঘটে, আর ছয় বছর পর ১৮৮৯ সালে মার্ক্সের বন্ধু এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে বেগবান করতে ডাক দেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের। সেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকেই জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের মে দিবস সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়; সিদ্ধান্ত হয় এই তাৎপর্যপূর্ণ দিবসটি ১৮৯০ সাল থেকে ১ মে প্রতিবছর একযোগে সারা বিশ্বে পালিত হবে।

মার্ক্স সে সময়ই শ্রমিকদের এই সংগঠিত শক্তিকে নতুন সমাজ গড়ার মূল শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি পুঁজিবাদী মজুরি ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতাকে অর্থশাস্ত্রীয় ও দর্শনগত দিক থেকে উন্মোচিত করেছেন, শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে ন্যায়ভিত্তিক ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বাস্তবে মূর্ত করে তোলার রসদ জুগিয়েছেন। শ্রেণিচেতনার হাতিয়ারে সুসজ্জিত শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ঐক্যের মাধ্যমে ‘আত্মাহীন সমাজ’ ও ‘হৃদয়হীন দুনিয়া’র বাস্তবতাকে বদলে ফেলার সংগ্রামকে প্রাণ দিয়েছেন।

‘মে দিবস’-এর তাৎপর্য শুধুমাত্র ‘আট ঘণ্টা কর্মদিবস’ বা ‘ন্যায্য মজুরি’র দাবি আদায়ের মধ্যে সীমিত নয়, বরং মে দিবস লেনিনের ভাষায় ‘মেহনতি মানুষকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপমান থেকে মুক্ত করার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম’কে সংগঠিত করতে আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। সেই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম লেনিনের ভাষায় ‘দুই দুনিয়া’র মুখোমুখি সংগ্রাম। এই দুই দুনিয়ার সংগ্রাম মূর্ত হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে। কখনও তা মজুরির সংগ্রাম, নিরাপদ কর্ম পরিবেশের সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের সংগ্রাম; আবার কখনও তা অর্থনীতিবাদের গণ্ডি টপকিয়ে শ্রেণি চেতনায় শাণিত হয়ে মানবিক সমাজ নির্মাণের জন্য উচ্চতর রাজনৈতিক সংগ্রামের চেহারা ধারণ করে।

২. বর্তমানে অসংখ্য জায়গায় লেনিনের উল্লেখিত ‘দুই দুনিয়ার সংগ্রাম’-এর ফ্রন্ট বিস্তৃত হয়েছে। উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সৃষ্ট ফিন্যান্স ক্যাপিটাল আজ তার জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। বহুজাতিক ব্যাংক ও করপোরেশনগুলো এখন বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। লগ্নি পুঁজি এখন দুনিয়াব্যাপী সঞ্চারণশীল।

বহুজাতিক এই একচেটিয়া কারবারের চাওয়া হল বিশ্বজুড়ে এক অখণ্ড বাজার প্রতিষ্ঠা, যাতে লগ্নি পুঁজির চলাচল বিন্দুমাত্র ব্যাহত না হয়। এই অর্থনৈতিক বাস্তবতাই মূলত বর্তমান বিশ্বে নয়া উদারনীতিবাদী বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই দর্শনের 'হেজিমনি' বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তারা ব্যবহার করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মিডিয়া, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াকে। এমনকি এর জন্য যুদ্ধ বাঁধানো থেকে শুরু করে দুনিয়াব্যাপী উগ্র ডানপন্থা কিংবা ধর্মীয় মৌলবাদকে উস্কে দিতেও তারা পিছপা হচ্ছে না। মার্ক্স ও এঙ্গেলস ১৭০ বছর আগে কমিউনিস্ট ইশতেহারে লিখেছিলেন, 'নিজেদের প্রস্তুতকৃত দ্রব্যের জন্য অবিরত প্রসারমাণ এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণিকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়।'[২] বর্তমান যুগের নয়া উদারনীতিবাদ কিংবা মুক্তবাজারের মূল তাড়নাও সেটি–'অবিরত প্রসারমাণ এক বাজারের তাগিদ'। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোর জাতীয় সম্পদ ও সস্তা শ্রমের প্রতি বড় বড় কোম্পানি, করপোরেশন ও পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর লোভাতুর দৃষ্টি। বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে তারা একদিকে যেমন খুব সস্তায় তাদের পণ্য উৎপাদন করাতে পারে, অন্যদিকে এইসব দেশে তাদের অনুগ্রহনির্ভর এবং কমিশনভোগী লুটেরা বুর্জোয়া শ্রেণির জন্ম দিতে পারে। তথাকথিত 'তৃতীয় বিশ্বের' এই অধস্তন লুটেরা বুর্জোয়ারা নিজের দেশের সম্পদ কমিশনের লোভে অন্যের হাতে তুলে দিতেও পিছপা হয় না। তাদের কেউ কেউ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাংক ও অন্যান্য খাত থেকে জনগণের সম্পদ লুটপাট করে বাইরের দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাবকন্ট্রাক্ট পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে, আর সে প্রক্রিয়ায় নিজের উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করতে শ্রমিকদের ওপর ভয়ংকর শোষণের স্টিম রোলার চালায়।

জন স্মিথ তাঁর ২০১৬ সালে প্রকাশিত 'ইম্পেরিয়ালিজম ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি'[৩] বইটির প্রথম অধ্যায় 'দ্য গ্লোবাল কমোডিটি'র প্রায় পুরোটাতে বাংলাদেশের সস্তা শ্রমকে দেখিয়েছেন উদাহরণ হিসেবে। বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকরা যে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণের সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ তা তাঁর ব্যাখ্যা করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। তিনি বইটিতে টনি নরফিল্ডের এক অনুসন্ধান থেকে পাওয়া বাংলাদেশের টি-শার্ট প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় চরম শ্রমশোষণের গল্পটি সেখানে বিবৃত করেন। ২০১১ সালে নরফিল্ডের এই অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত 'এইচ অ্যান্ড এম' ব্র্যান্ডের একটি টি-শার্ট জার্মানিতে ৪ ইউরো ৯৫ সেন্টে বিক্রি হয়। এইচ অ্যান্ড এম বাংলাদেশি ফ্যাক্টরি মালিকের কাছ থেকে এই টি-শার্ট কেনে ১ ইউরো ৩৫ সেন্টে, যার আবার ৪০ সেন্ট খরচ হয় আমেরিকা থেকে কাঁচামাল কিনতে, ৬ সেন্টের মত খরচ হয় মালামাল পরিবহনে। নরফিল্ড হিসাব করে দেখান, জার্মানির এইচ অ্যান্ড এমের দোকানে ৪.৯৫ ইউরোর যে টি-শার্ট বিক্রি হয়, তার ৩.৫৪ ইউরোই যোগ হয় জার্মান জিডিপিতে (জার্মান সরকারই প্রতিটি টি-শার্টে ভ্যাট পায় ০.৭৯ ইউরো), আর বাংলাদেশের জিডিপিতে যোগ হয় মাত্র ০.৯৫ ইউরো। তাহলে শ্রমিকরা কত পাচ্ছে? নরফিল্ড দেখাচ্ছেন, যে ফ্যাক্টরিতে এইচ অ্যান্ড এমের টি-শার্ট প্রস্তুত হচ্ছে, সেখানে একজন সেলাই শ্রমিক ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করে পাচ্ছে প্রতিদিন মাত্র ১.৩৬ ইউরো। হিসাব করে দেখা গেছে, একটি টি-শার্ট প্রস্তুতকরণে সব ধরনের শ্রমিকের পেছনে শ্রমশক্তি কেনার খরচ মাত্র ১০-১২ সেন্টের মত। এইচ অ্যান্ড এম জার্মান সরকারকে ভ্যাট দিয়ে, শোরুম, বিজ্ঞাপন, মার্কেটিং-অ্যাডমিন এক্সিকিউটিভ ও সেলস ম্যানেজারদের বেতনসহ সব ধরনের খরচ করেও প্রতি টি-শার্টে মুনাফা করে ৬০ সেন্ট, যা টি-শার্ট তৈরিতে প্রযুক্ত শ্রমশক্তির প্রাপ্ত মোট মজুরির তুলনায় ৫-৬ গুণ বেশি। আবার নরফিল্ড বাংলাদেশি যে কারখানায় অনুসন্ধানটি চালিয়েছেন, সেখানে প্রতিদিন ১ লাখ ২৫ হাজার টি-শার্ট প্রস্তুত করা হয়। সব ধরনের শ্রমিকের মজুরি, এক্সিকিউটিভের বেতন, কারখানা পরিচালনা খরচ মিটিয়ে প্রতিটি টি-শার্টে প্রতিদিন যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয়, তাতে দেশীয় গার্মেন্ট মালিকেরও দিনশেষে মোটা অঙ্কের মুনাফাকেই নির্দেশ করে।

জন স্মিথ তাঁর ২০১৬ সালে প্রকাশিত 'ইম্পেরিয়ালিজম ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি' বইটির প্রথম অধ্যায় 'দ্য গ্লোবাল কমোডিটি'র প্রায় পুরোটাতে বাংলাদেশের সস্তা শ্রমকে দেখিয়েছেন উদাহরণ হিসেবে। বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকরা যে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণের সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ তা তাঁর ব্যাখ্যা করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

এর পরও আমাদের দেশে গার্মেন্ট শ্রমিকের মজুরি বাড়ানোর কথা শুনলেই শিল্পখাত ধ্বংস হয়ে গেল বলে রব ওঠে, নিম্ন মজুরির কথা বাদ দিলেও দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ কারখানায় নিরাপদ কর্ম পরিবেশটুকুও নেই। বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকরা এই দুরবস্থার মধ্যেও দেশের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তাদের শ্রমের ফসলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশি করপোরেটস এবং দেশীয় লুটেরা ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী সরকারগুলো শ্রমিকদের কণ্ঠরোধ করতে কেড়ে নিচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, গঠন করেছে শিল্প পুলিশ, মামলা-নির্যাতনের মুখোমুখি করছে শ্রমিকদের।

৩. রানা প্লাজার রক্তের দাগ, তাজরীনে পোড়া দগদগে ঘা এখনও শুকায়নি। প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে ৪০ লক্ষ গার্মেন্ট শ্রমিক, যার অধিকাংশই নারী। বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি এখন ৫৩০০ টাকা, যা দিয়ে ঢাকার আশপাশে শুধু একটা ছোট ভাড়া বাসাও জোগাড় করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। গার্মেন্ট শ্রমিকরা এবং তাদের সংগঠনগুলো বর্তমান বাজারদর বিবেচনা করে ১৬ হাজার টাকা নিম্নতম মজুরির দাবি তুলেছে। একটা মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে, যা বসতে বসতেই দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশের গার্মেন্ট মালিকরা শ্রম আইনের ধার ধারেন না। তাঁরা কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই করেন, বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ করে দেন, শ্রমিকদের পাওনা বেতন-বোনাস দিতে গড়িমসি করেন। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে শ্রমিকদের কাছ থেকে। সরকার কিংবা মালিকদের ধামাধরা না হলে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন হয় না। বাংলাদেশে শ্রম আইনে কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কার করার প্রয়োজন থাকলেও তা না করে সরকার পূর্বতন সরকারগুলোর ধারবাহিকতায় শ্রম আইনের আরও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সংশোধন করার পাঁয়তারা করছে।

গার্মেন্ট শ্রমিকরা এই অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রায়ই মাঠে নামছে। শ্রমিকদের মধ্যে বাড়ছে অসন্তোষ। এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে জোরজবরদস্তি দিয়ে দমন করতে গঠন করা হয়েছে শিল্প পুলিশ। মালিকপক্ষ ও সরকার একজোট হয়ে শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর ওপর চড়াও হচ্ছে। সম্প্রতি মালিকদের সংগঠন

বিজিএমইএর দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় জেল খেটে জামিনে মুক্ত হলেন গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদারসহ সাতজন কেন্দ্রীয় নেতা। এখনও জেলে আছেন ওই সংগঠনের সদস্য, রামপুরার আশিয়ানা গার্মেন্টসের দুই শ্রমিক রাসেল ও মুন্না। কী কারণে তাঁদের জেলে যেতে হল? মে দিবসের প্রাক্কালে এই কেস স্টাডি করলে জানা যাবে, বাংলাদেশে গার্মেন্ট শ্রমিকরা আসলে কতটা নিপীড়নের শিকার।

৪. গত ৩১ জানুয়ারি বিজিএমইএ ভবনের সামনে ভাঙচুরের ঘটনায় ১৫ জন শ্রমিক নেতার নাম উল্লেখ করে এবং আশিয়ানা গার্মেন্টসের ১৫০ জন অজ্ঞাতনামা শ্রমিককে আসামি করে মামলা করে বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ। কী ঘটেছিল আসলে ৩১ জানুয়ারি? ঘটনাটি জানতে হলে আরেকটু পেছনে যেতে হবে।[৪] আশিয়ানার ৭০ শতাংশ শ্রমিক গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সদস্য। তারা নিয়মিত প্রতি মাসে ১০ টাকা চাঁদা দিয়ে ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে সেখানে। একসময় তারা বেশ খাটাখাটনি করে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা শুরু করে। অধিকাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষরসহ সেই কাগজপত্র এ সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া হয়। মালিকপক্ষ খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়। নানাভাবে শ্রমিকদের শাসাতে থাকে।

শ্রমিকদের সেই ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়নি। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, মালিকপক্ষের সরবরাহকৃত শ্রমিক তালিকা ও স্বাক্ষরের সাথে নাকি অধিকাংশ শ্রমিকেরই স্বাক্ষর মেলেনি। খেলা কোথায় হয়েছে, শ্রমিকরা তা সহজেই বুঝে যায়। তার পরও তারা আবার কাগজপত্র প্রস্তুত করতে থাকে। আবার তৈরি করা কাগজপত্র জমা দিতে গিয়ে তারা শোনে, ইতিমধ্যেই নাকি সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড হয়ে গেছে! ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি কে? সভাপতি মালিকের আত্মীয়, যিনি অ্যাকাউন্টসে বসেন, শ্রমিক হিসেবে তাঁকে দেখিয়ে বলা হয় তিনিই ট্রেড ইউনিয়ন নেতা! এই হচ্ছে বাংলাদেশের 'আইনি' ট্রেড ইউনিয়ন! এই হচ্ছে শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার!

সেদিন শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের এক পর্যায়ে বিজিএমইএর সিনিয়র অতিরিক্ত সচিব মনসুর এলেন দলবল নিয়ে। তিনি সমাবেশ করতে দেবেন না। হামলে পড়ে মাইকের তার ছিঁড়ে ফেলা হল, এর পরই শুরু হল সংঘর্ষ। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবিগুলোও প্রমাণ করছে, বিনা উস্কানিতে বিজিএমইএর লোকজন রড, লাঠিসোঁটা নিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা করে।

আশিয়ানার শ্রমিকদের ইউনিয়ন সংগঠিত করার পেছনে ভূমিকা ছিল মামুন নামের একজন শ্রমিকের। সেই শ্রমিককে হেনস্তা করার সুযোগ খোঁজে মালিকপক্ষ। তিনি যাতে শ্রমিকদের সংগঠিত না করতে পারেন, সে কারণে তাঁর ফ্লোর বদলে দেয়া হয়। মামুন ও তাঁর সহযোদ্ধা শ্রমিকরা এর প্রতিবাদ করেন। এরপর গত ২৯ জানুয়ারি মামুনকে ছাঁটাই হওয়ার কাগজ ধরিয়ে দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে শ্রমিকরা। তারা এক বেলা কাজ বন্ধ করে দেয়। ৩০ তারিখ শ্রমিকরা পুনরায় কাজে এসে দেখে ঝুলছে কারখানা বন্ধের নোটিশ। অবাধ্য শ্রমিকদের শায়েস্তা করার পুরনো পন্থা! শ্রমিকরা রাস্তায় নামে, শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করে পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যদের সাথে। নেতাদের সাথে আলাপ করে তারা পরদিন শ্রম মন্ত্রণালয় ঘেরাও করবে বলে ঠিক করে। এর পরপরই প্রশাসনের লোকজন বলে ঘেরাও না করে বিজিএমইএতে গিয়ে মালিকের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে। মালিক বিজিএমইএ ছাড়া অন্য কোথাও নাকি শ্রমিক নেতাদের সাথে বসবে না।

আশিয়ানার শ্রমিকরা গেল বিজিএমইএতে মিটিং করতে। হঠাৎ বলে দেয়া হল মিটিং হবে না। শ্রমিকরা অগত্যা সেখানেই বসে পড়ল। এই শ্রমিকরা বা তাদের নেতৃত্ব এর আগে বহুবার বিজিএমইএসহ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতর ঘেরাও করেছে, মালিকপক্ষের সাথে মিটিং হয়েছে বহুবার বহু ইস্যুতে। শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে সমাধান, কখনও কখনও প্রত্যাশামাফিক দাবি মেটেনি, তার পরও শ্রমিকরা মেনে নিয়েছে। তাহলে সেদিন কেন সংঘর্ষ হল? কেননা সেদিন শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের এক পর্যায়ে বিজিএমইএর সিনিয়র অতিরিক্ত সচিব মনসুর এলেন দলবল নিয়ে। তিনি সমাবেশ করতে দেবেন না। হামলে পড়ে মাইকের তার ছিঁড়ে ফেলা হল, এর পরই শুরু হল সংঘর্ষ। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবিগুলোও প্রমাণ করছে, বিনা উস্কানিতে বিজিএমইএর লোকজন রড, লাঠিসোঁটা নিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা করে। এরপর পরিস্থিতি শ্রমিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অস্বীকার করার কিছু নেই, উত্তেজিত শ্রমিকরাও সংঘর্ষে জড়িয়েছে, প্রতিরোধ করেছে গুণ্ডাদের। গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বলছে, সেদিন সংঘর্ষের পর ৩৭ জন শ্রমিক আহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়। এমনকি পত্রিকায় পুলিশের বরাত দিয়ে তখন বলা হয়, ২৫ জন শ্রমিক হাসপাতালে।

ওইদিনই রাতে শ্রমিকদের তরফ থেকে এ ব্যাপারে মামলা করতে গেলে মামলা না নিয়ে পুলিশ বলেছে পরদিন আসতে। পরদিন শোনা গেল বিজিএমইএ মামলা দিয়েছে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মন্টু ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদারসহ ১২ জন শ্রমিক নেতা ও ১৫০ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে। মন্টু ঘোষ কিংবা জলি তালুকদার ওইদিন ঘটনাস্থলেই ছিলেন না। তাঁদের নামে আনা হয় অ্যাটেম্পট টু মার্ডারসহ ল্যাপটপ, মোবাইল চুরির হাস্যকর অভিযোগ। ৩ ফেব্রুয়ারি কারখানার সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয় রাসেল ও মুন্না নামের দুজন শ্রমিককে, যাঁরা এখনও কারাগারে। শুধু তাই নয়, ২৬ জন শ্রমিককে কারখানা থেকে ছাঁটাই করা হয়। রাসেল, মুন্নাকে আটক করার পর এজাহারভুক্ত শ্রমিক নেতারা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হবার পর সিএমএম কোর্টে সারেন্ডার করার সময় জলি তালুকদারসহ ৭ জন শ্রমিক নেতাকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। মামলা ছিল জামিনযোগ্য, এবং হাইকোর্ট কর্তৃক জামিনও দেয়া হয়েছিল, তার পরও উপর মহল থেকে দেয়া নির্দেশের কারণে শ্রমিক নেতাদের জামিন বাতিল করা হয় বলে শোনা যায়। এরপর বিজিএমইএ শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে আদালতে রিমান্ডের আবেদন করে। রিমান্ডের শুনানির পূর্বেই অবশ্য হাইকোর্ট পুনরায় নেতৃবৃন্দের জামিনের আদেশ দেন। ৯ দিন জেল খেটে ৯ এপ্রিল মুক্ত হন নেতৃবৃন্দ।

৫. বিজিএমইএও হঠাৎ এত তৎপর হয়ে শ্রমিক নেতাদের জেলে পাঠাতে তোড়জোড় করার কারণ কী? আসল কারণ হল, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬০০০ টাকার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলছে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। শ্রমিকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই দাবি। গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ছে,

শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। এই সময়ে হামলা করে, উল্টো মামলা দিয়ে শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখাতে পারলে একতরফাভাবে ন্যূনতম মজুরির ঘোষণা দেয়া সহজ। এমনিতেই গঠিত মজুরি বোর্ডে কোন প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধি নেই, সুতরাং টেবিলে দর-কষাকষির সুযোগ নেই। মাঠের আন্দোলনের পথও বন্ধ করতে তাই নির্যাতনের আশ্রয় নেয়া! প্রশাসন, পেশিশক্তি, অর্থ, মিডিয়া–সবই ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না মালিকরা এই আন্দোলন ঠেকাতে। প্রতিবারই মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন যখন হয়, তখন শ্রমিক নেতাদের নামে মামলা হয়। ২০১০ সালেও যখন আন্দোলন হয়েছিল মজুরি বৃদ্ধির, তখন গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মন্টু ঘোষকে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো হয়েছিল, তিনি সহ বহু গার্মেন্ট শ্রমিক জেল খেটেছিলেন।

অন্যদিকে হাতিরঝিলে এখনও দম্ভ ভরে দাঁড়িয়ে আছে বিজিএমইএ ভবন। হাইকোর্ট এই ভবনকে অবৈধ ঘোষণা করে ভাঙতে বলেছেন বহু আগে। কিন্তু মালিকদের ভবন বলে কথা! হাতিরঝিল করতে কত কিছু যে ভাঙা গেল, কিন্তু বিজিএমইএ ভবনে এমনকি সেনাবাহিনীও হাত দিল না। দফায় দফায় বিজিএমইএ ভবন সরিয়ে নিতে বারবার সময় নেয়া হচ্ছে আদালত থেকে, বিজিএমইএ ভবনটি ভাঙা আর হচ্ছে না। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সেই গতিও কখনও শথ, কখনও দ্রুততর!

মালিকপক্ষের রাষ্ট্রে এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক হচ্ছে শ্রমিক ইস্যুতে আমাদের মত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নির্লিপ্ততা ও উন্নাসিকতা। শাসকশ্রেণির তৈরি করা বয়ানের বিপরীতে পাল্টা বয়ান তৈরির মত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও অত্যন্ত কম। এ কারণে গার্মেন্ট সেক্টরে সরকার ও মালিকপক্ষ বাধাহীনভাবে একচেটিয়া জুলুম চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। মে দিবসের প্রাক্কালে আশিয়ানা গার্মেন্টসের শ্রমিক এবং মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ওপর জেল-জুলুম-নির্যাতন আসলে আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত চিত্রই তুলে ধরছে।

আমাদের দেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের নিংড়ে নেয়া হচ্ছে, তাদের ওপর নেমে আসছে ডাবল শোষণের খড়্গ। একদিকে নামকরা ব্র্যান্ড এবং পশ্চিমা দেশের সরকারগুলো আমাদের শ্রমিকের প্রস্তুতকৃত পণ্যে লাভবান হচ্ছে, অন্যদিকে দেশি গার্মেন্ট মালিকরাও বাগিয়ে নিচ্ছে মোটা অঙ্কের মুনাফা। এই সময়ে পুঁজিবাদ যেহেতু বিশ্বায়িত, তাই আমাদের দেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের সংগ্রাম দুনিয়ার অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সস্তা শ্রমের লোভে বড় বড় কোম্পানিগুলো আমাদের মত শ্রমিকদের খুব নিম্ন মজুরিতে খাটিয়ে নিচ্ছে, আর এ কারণেই আবার পশ্চিমা বিশ্বে বাড়ছে বেকারত্ব-অস্থিরতা। পুঁজিবাদ এক অস্থির টালমাটাল পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে, বাঁচার জন্য তাকে উগ্র ডানপন্থার পথ নিতে হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা মোদির মত উগ্র ডানপন্থী নেতাদের নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ নিয়ে হাজির হয়েছে পুঁজিপতিরা। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের ডামাডোল বাজানো হচ্ছে। আমাদের দেশেও ডানপন্থা শক্তিশালী হচ্ছে। এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় তাই এই সময়ে মে দিবস বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

মে দিবস নিছক আনুষ্ঠানিক কোনো শ্রমিক দিবস নয়, মে দিবস শ্রেণিচেতনার হাতিয়ারে সুসজ্জিত হবার দিন। বাংলাদেশে আন্দোলনরত গার্মেন্ট শ্রমিকরা সেই হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে উঠুক, আদায় করে নিক তাদের দাবি। এবারের মে দিবস সেই বার্তাই ছড়িয়ে দিক চতুর্দিকে।

অভিনু কিবরিয়া ইসলাম: সহকারী অধ্যাপক, অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: okicpb@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১। ১৯০৪ সালের ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন একটি লিফলেটের জন্য রচনাটি লেখেন। উৎস: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1904/apr/30a.htm
২। কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট ইশতেহার, ১৮৪৮
৩। John Smith, Imperialism in the Twenty-First Century, Globalization, Super-Exploitation and Capitalism's Final Crisis, Monthly Review Press, New York, p-13,14,15
৪। বিস্তারিত জানতে পড়ুন:
https://www.thedailystar.net/star-weekend/labour-rights/-silencing-the-labour-movement-1561999

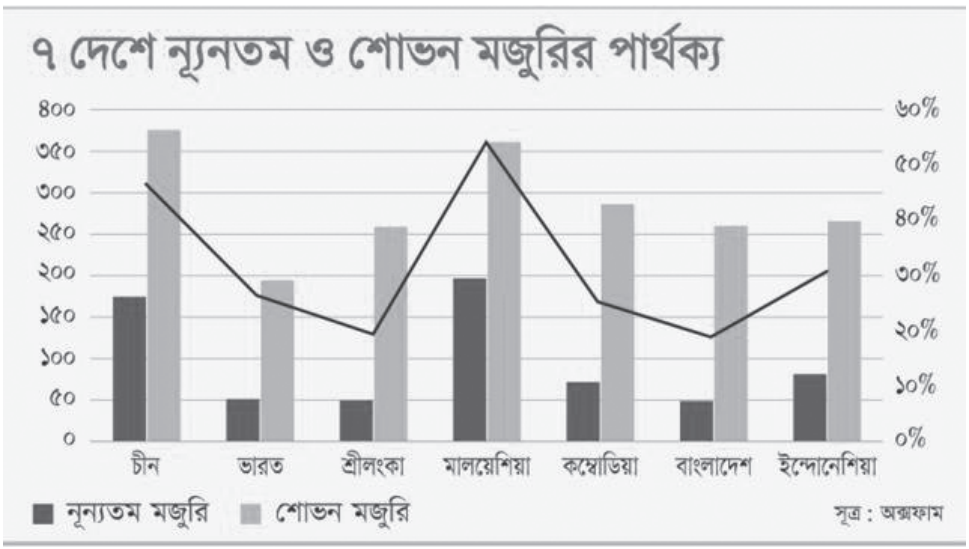

সূত্র: প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০১৮